সূচি

ধ্বংসস্তূপে একা...	০৭
শীলভদ্রের উপন্যাস	১৩
সিংহাসন	৭৫
অবলোকিতেশ	৮৫
প্রথম নৈঃশব্দ্য	৯৩
কামাল আতাতুর্কের দ্বিতীয় চিঠি	১০৩
আর্কিমিডিসের লাঠি	১২০
মানিকবাবু বনাম হোসেন মিয়া	১২৯
গুটেনবার্গ সমস্যা	১৩৫
শবসঙ্কট	১৪১
ব্লিৎসক্রিগের পর, তুমি? তুমি!	১৪৮
প্রতারক	১৬১

Scanned with OKEN Scanner

ধ্বংসস্তূপে একা...

একদিন শেয়ালদা স্টেশনের চত্বরে দাঁড়িয়ে অবনীশ দেখেছিল মই বেয়ে উঁচুতে উঠে একটি লোক দুহাতে কালো বড়ো-বড়ো অক্ষর ধরে নিউজবোর্ডের প্রকাণ্ড শাদার গায়ে খবর পালটে দিচ্ছে। খবরের যাথার্থ্য সম্পর্কে অবশ্য প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। ...অবনীশ জানে স্বর্গবেশ্যা আর পারমাণবিক চুল্লির একই আহ্লাদি ডাকনাম— 'অপ্সরা'। ...শব্দের পেছনে সত্যিই কি এমন কোনো নিরঞ্জন স্পন্দনের কাঠামো আছে যা সাপ বাঁশির সুরের নীচে শারীরিকভাবে টের পায়?

'লেখার খেলা' নামে একটি চটি বই লিখেছিলেন অরূপরতন বসু। দেরিদার 'অফ গ্রামাটোলজি' ও অন্যান্য লেখাপত্রের অনুষঙ্গ টেনে অরূপরতন দেখান 'লেখা'র ভিতর 'অর্থ'-র (meaning) তথাকথিত উপস্থিতি কতটা ভঙ্গুর। যে-লিখনপ্রক্রিয়াকে আমরা 'পবিত্র' বা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' বলে জানি, তা আসলে একধরনের আকস্মিকের খেলা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বাংলা গদ্যে অরূপরতন সেই বিরল লেখকদের একজন যিনি আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত বাংলা গদ্যের পরম্পরাকে প্রশ্ন করেছেন। কেবল উপরিতলের পরীক্ষানিরীক্ষাই নয়। অরূপরতন তাঁর লেখায় জড়িয়ে নিয়েছিলেন প্রবহমান জীবনের সেই ক্যালাইডোস্কোপিক বর্ণালী, যা আমাদের ধ্বস্ত, হাঁটু-মুড়ে-বসে-পড়া সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা চরিত্রগুলোর পোশাক খুলে ফেলে, বের করে আনে এই অন্তর্লীন বাস্তবতার ভয়-অসহায়তা-মায়ার জগৎকে।

স্থির, একরৈখিক, উদ্দেশ্যমুখী প্রগতির ছকে বস্তুসমূহকে সাজাতে চেয়েছিল যে-'আধুনিকতা', অরূপরতন প্রথম থেকেই ছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ। ফলত, লেখার অন্তর্গত রাজনীতি এবং লিখনশৈলি দুইদিক থেকেই অরূপরতন, সেই অন্ত্য-ষাট বা আদি সত্তর থেকেই ভিন্ন পথের যাত্রী। 'যোগসূত্র' পত্রিকার এপ্রিল-জুন ১৯৯২ সংখ্যায় একটি গদ্য লেখেন অরূপরতন : 'কারুবাসনা ও জীবনানন্দের গদ্য'। এই লেখায় তিনি দেখান, কীভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস হয়ে ওঠে একটি স্পষ্ট জলবিভাজিকা। পরবর্তী সময়ের গদ্য কোনদিকে এগোবে, সে সম্পর্কে সূত্রাকারে কিছু কথা বলেন অরূপরতন। পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য ন্যারেটিভের সংকটকে চিহ্নিত করেন তিনি: 'লেখকের ভূমিকা এখানে অনেকটা সর্বশক্তিমান নিউটনীয় খ্রিষ্টান ঈশ্বরের মতো, যিনি বিশ্বজগৎকে বাইরে থেকে একটি অতিকায় ঘড়ি হিসেবে দেখছেন— অর্থাৎ যিনি জগৎকে অবজেকটিভলি দেখছেন। ফলে এই জগতে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব, এখানে পরমাণুর

Scanned with OKEN Scanner

মতোই চেতনার অবস্থান বা ব্যক্তিমানুষের অবস্থান জানলে তার পরিণাম বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ ও তার চেতনা এই সবকিছুই এঁদের হিসেবের খাতায় ঠিকঠাক ধরা আছে, কোনও অনিশ্চয়তার জায়গা এখানে নেই। ...যেমন বিশ্বজগৎ তেমনি মানব চৈতন্যকেও এঁরা পুরোপুরি হিসেবের খাতায় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।' —এই সর্বজ্ঞ লেখক-অবস্থানের অনড় কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসেন অরূপরতন। তৈরি করতে চান এমন এক ওপেন-এন্ডেড ফর্ম, 'যেখানে সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৈতন্যের এমন একটি স্তরকে ছোঁওয়ার আকাACby যা সমাজ-সংস্কার, ধর্মপ্রচার, লোকশিক্ষা, ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক প্রচার এসব কিছুই নয়। যা সৃষ্টির রহস্য তথা এক কালহীন অনন্ত সত্যের গূঢ় শৃংখলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এইদিক থেকে দেখতে গেলে... গদ্য সাহিত্য, ...কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে আসে।' এবং 'উপন্যাস হচ্ছে অমোঘভাবে লেখকের অন্তর্জীবনের এক পরিচয়, উন্মোচন, যা নিছক আত্মজীবনী নয়, স্বীকারোক্তি নয়, স্মৃতিচারণ নয়, অথচ যার মধ্যে এই সমস্ত উপাদানই আছে মিলে মিশে।'

এই ভিন্ন অভিমুখ থেকেই গদ্যসাহিত্যের এক সম্পূর্ণ পৃথক ঘরানার দিকে যাত্রা করেন অরূপরতন। হাতে-গোনা কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটোগল্প, ছড়ানো-ছেটানো কিছু প্রবন্ধ জাতীয় রচনা ও অন্যান্য রচনায় ছড়িয়ে থাকে সেই অভিযাত্রার চিহ্ন। তেমনই কয়েকটি লেখার সংকলন এই বই।

২.

'অন্তরীপ' উপন্যাস নয়, বরং একে বলা যেতে পারে 'আধুনিক নভেলের মৃত্যু-সংবাদ।' শীলভদ্র একটি উপন্যাস লেখে,যার কাহিনি গড়ে উঠেছে একজন তরুণ ঔপন্যাসিককে ঘিরে। যে তার নিজের উপন্যাস থেকে একটি চিত্রনাট্য তৈরি করতে চাইছে। তার গোটা উপন্যাসই যেন 'উপন্যাস' এবং 'চিত্রনাট্যে'র ভিতর নিহিত যাতায়াতের প্রক্রিয়া। তার উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরা হল : তরুণ ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার রজত, পরিচালক হিমাদ্রিবাবু ও তাঁর সহকারী মণীষা। উপন্যাসটি লিখতে লেখক যায় উপন্যাসেরই বাস্তব পটভূমিতে, অর্থাৎ কন্যাকুমারীর সমুদ্রসৈকতে। তার সঙ্গে পরিচালক ত্রিদিববাবু ও তাঁর সহকারী সুলেখা। বাস্তবের কন্যাকুমারী ও এই তিন ব্যক্তি এবং উপন্যাসের তিন চরিত্র ও কন্যাকুমারী হয়ে দাঁড়ায় দুটি অক্ষ। একটি প্রতিমুহূর্তে অন্যকে ওভারল্যাপ করে। কিন্তু 'অন্তরীপ'-এর ন্যারেটিভ দাঁড়িয়ে আছে এক তৃতীয় অক্ষে। প্রকাশকের অনুরোধে শীলভদ্রের মূল উপন্যাসটির ভূমিকা লিখতে রাজি হন লেখক। 'অন্তরীপ' সেই না-উপন্যাসেরই 'ভূমিকা'। তবে 'ভূমিকা' বলতে সচরাচর যা বোঝায় তার সঙ্গে এর মিল নেই। এই লেখার সমগ্র অংশ জুড়েই রয়েছে 'ভূমিকা'-র উপস্থিতি। এবং বারেবারেই মূল লেখাকে স্থগিত রেখে টেক্সটকে আরও প্রশ্নার্ত করে তোলার জন্যই 'ভূমিকা'র অতিসক্রিয় কার্যকারিতা এই ন্যারেটিভকে বানিয়ে তুলেছে এক উত্তর-আধুনিক বয়ান। কারণ এই লেখায় 'ভূমিকা' যেন পিতৃহন্তারক পুত্র, মূল টেক্সটকে বারবার হত্যা করে 'ভিন্ন অর্থের

Scanned with OKEN Scanner

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব' তৈরি করাই তার কাজ। এভাবেই সে এক গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় উপনীত হয়, যে মূল গ্রন্থের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে। টেক্সট হয়ে ওঠে সম্পূর্ণভাবেই একধরনের হওয়া/না-হওয়া, থাকা/না-থাকা, অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের খেলা। একইসঙ্গে সে নিজেই হত্যাকারী ও নিহত।

পাশাপাশি 'অন্তরীপ'-এ রয়েছে একটি ক্ষীণ স্টোরিলাইন। 'অন্তরীপ' সমুদ্রতীরবর্তী এমন একটি স্থান, যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। এক স্বতশ্চল অক্ষরছবির মতো করেই এখানে ধরা থাকে লেখক-সহকারী মেয়েটি এবং পরিচালকের বদলে-যেতে থাকা সম্পর্কের ত্রিভুজ। কাহিনি-কল্পনা-বাস্তব একাকার হয়ে যেতে থাকে। ঘটনাক্রম থেকে লিখিত টেক্সট তৈরি হবার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া এটি, এখানে টেক্সট নিয়ন্ত্রণ করছে ঘটনাকে। অসম্পূর্ণ চিত্রনাট্যের সম্ভাব্য/অসম্ভাব্য বদল অনুযায়ী পালটে যাচ্ছে ঘটনার অভিমুখ। তামিলদের দশহাজার বছরের পুরনো লুপ্ত সভ্যতার স্মৃতি যেমন বেঁচে রয়েছে, হারিয়ে গেছে নবলম দ্বীপে তাদের রাজধানী 'প্রথম মাদুরাই'। তেমনই অরূপরতন বসুর এই লেখাও পরিত্যক্ত শহর ধনুষ্কোটিতে কাহিনির মনীষা আর রজত গিয়ে পৌঁছনোর পর উপন্যাসের শীলভদ্র-সুলেখার সেই জায়গায় পৌঁছনো এবং বাস্তব আর স্বপ্নের ভিতর নিরন্তর ডায়ালগ শুরু হবার এক মহড়া। এবং ক্রমশই বোঝা যায় লিখিত টেক্সট, অথবা ক্রমাগত বদলে যেতে থাকা চিত্রনাট্য— কোনওটাই রক্তমাংসের মানুষের স্বতশ্চল সত্তাকে ধরে রাখতে অক্ষম। চিত্রনাট্য অনুযায়ী চরিত্রেরা আচরণ করে না। যখন সুলেখা বলে ওঠে, আমাকে আপনি, আপনার গল্পের মধ্যে, গল্পের চরিত্রের জীবনের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য করছেন। এটা আপনি পারেন না...', শীলভদ্র-র শান্ত উত্তর ছিল 'একটা রাস্তা আছে লেখককে সরিয়ে দিন, শুধু তার উপন্যাসটা থাক।' অর্থাৎ চরিত্রেরা স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠছে, ন্যারেটিভের ফ্রেম ভেঙে ফেলে। তবে ত্রিদিববাবুর ফিল্মে রজত সাঁতার জানত না, তাই সমুদ্রে ডুবে মারা যাবার সময় মনীষাকে সে কোনও সাহায্য করতে পারেনি। উলটো দিকে শীলভদ্র সাঁতার জানত, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই সুলেখার হাত ছেড়ে দেয়। এই প্রতারক নিষ্ঠুরতার লুকোনো পার্থক্যই প্রমাণ করে 'অন্তরীপ' কোনও নভেল নয়, এখানে নভেল-সম্পর্কিত ধারণাসমূহ এক ত্রিমাত্রিক উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে।

> লেখা কী ও কেন তা গবেষক ভাবেন; লেখক পারেন শুধু পরিত্যক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করে থাকতে, কখন ভিতর থেকে অবলম্বন ভেঙে যায়, কেননা, ইতিহাস নয়, এক সুদূর অগ্নিপুঞ্জ থেকে আমরা স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে নেমে আসি ও ফের শিখার মতো উঠে চলে যাই। ...যা দাহ্য, তাকে সহজে স্পর্শ করে আগুন, যাতে আগুন সহজে স্পর্শ করে তার জন্য লেখা, ধীরে ধীরে, গোপনে, নিজেকে দাহ্য করে তোলে।
>
> ধ্বংসস্তূপ, তারই পরিণাম।

'ধ্বংসস্তূপ' সংকলনের মুখবন্ধ হিসেবে, এই কটি পঙ্‌ক্তি লিখেছিলেন অরূপরতন। উপন্যাসের মতোই, ছোটোগল্প লেখার ক্ষেত্রেও 'আধুনিকতা'র নিশ্চিন্ত প্রত্যয় ছাপিয়ে

তিনি হয়ে ওঠেন একজন 'উত্তর-আধুনিক' প্রশ্নার্ত শিল্পী, যিনি লিনিয়ারিটির জায়গায় নন্-লিনিয়ারিটি, অনড় অবস্থানের বদলে সম্ভাবনার বহুমাত্রিক কাঠামো এবং সামগ্রিকতার বিপরীতে ভগ্নাংশের গুরুত্বকেই স্বীকার করে নেন নিজের লেখায়। 'প্রথম নৈঃশব্দ্য' গল্পটি বিভিন্ন কারণে স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে, কারণ রাজনৈতিকতা ও শৈলি উভয় দিক থেকেই এই গল্প অরূপরতনের নিজস্ব অবস্থান চিনিয়ে দেয়। গল্পটির রচনাকাল ১৯৭৩। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অতদিন আগে থেকেই অরূপরতনের অবস্থানের রাজনীতির আগাম আভাস এতে পাওয়া যায়। এই গল্পের পটভূমি '৭০-'৭১ সালের নকশালপন্থী আন্দোলনের মুখ থুবড়ে পড়ার পর তীব্র অন্তর্দলীয় কলহ, উপদলীয় অবিশ্বাসের বাতাবরণে সৎ, মার্ক্সবাদী সোমেশের আত্মিক সংকট, অসহায় একাকিত্ব এবং সন্ত্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া। সোভিয়েত ভেঙে যাবার পর তালাবন্ধ আর্কাইভের দলিল ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসছে অসংখ্য দমচাপা কাহিনি— হিংস্র দলতন্ত্রের পেষণে ব্যক্তিমানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে যাওয়া, সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থে ভ্রাতৃহত্যার জঘন্যতম রাজনীতি। এই গল্পের সোমেশ এম.এল. পার্টির স্কোয়াড সদস্য, অথচ সে বোঝে হিংস্র ব্যক্তিহত্যাই শ্রেণিসংগ্রাম নয়। তাই সে সরে আসে দলীয় কার্যক্রম থেকে, কিন্তু বেরোতে পারে না, তীব্র সন্দেহ আর পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেয়। সে টের পায় মতাদর্শগত শুদ্ধতার নামে তারা যে রাজনীতির চর্চা করছে তা প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ গোষ্ঠী আনুগত্যের অন্ধকার চোরাগলি। এই বোধ তাকে একদিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, অন্যদিকে তাকে তাড়া করে ফেরে যে কোনও মুহূর্তে একদা পার্টি-কমরেডদের হাতে খুন হয়ে যাবার ভয়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীসদস্য দীপকের প্রচ্ছন্ন হুমকি, প্রাণ হাতে নিয়ে সোমেশ আত্মগোপন করতে চায় পত্রিকা সম্পাদক বিমলের দপ্তরে। অথচ মতাদর্শগত লাইনের পার্থক্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে চাইলে বিমল উৎসাহ দেখায় না, তার উদ্দেশ্য এই দলচ্যুত একদা-নকশালটিকে বাণিজ্যপণ্যে পরিণত করা। সোমেশ বুঝতে পারে সে একটি বাতিল ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে। একটি বৈপ্লবিক দর্শনের নিহিত অর্থময়তার মৃত্যুই তার পরিণতি। সেই মৃত্যু আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে, যখন তার দলত্যাগ ও আদর্শে অবিচল থাকার সূত্র ধরেই পাশ থেকে সরে যায় এতদিনের প্রেমিকা রমলা, অন্যভাবে পার্টি থেকে সরে যাওয়া দীপকের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নেয় সে। সম্পর্কের দ্বন্দ্ব নিয়ামক হয়ে ওঠে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের সাপেক্ষে। 'প্রথম নৈঃশব্দ্য' সেই অস্তিত্বের শান্ত মৃত্যুর গল্প শোনায়।

'কামাল আতাতুর্কের দ্বিতীয় চিঠি' গল্পের নির্মাণশৈলি অভিনব। আনন্দবাজার পত্রিকার কাটিং ও বিজ্ঞাপন, চোখের নিমেষে সময়ের আগুপিছুর পরস্পরবিরোধ ঝাঁকুনি গল্পটিকে এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। নাগরিক পরিশীলিত প্রথা না-মানা যুবক-যুবতীদের মাঝখানে, ছন্নছাড়া তরুণ কবি-শিল্পীদের দঙ্গলে কোথা থেকে যেন ঢুকে পড়ে কামালের মতো অজ্ঞাতকুলশীল বোহেমিয়ান চরিত্রটি। সে পেশাদার বিপ্লবী ছিল না, এমনকী তার বোহেমিয়ানিজম্ও অর্থোডক্স মার্ক্সবাদীর চোখে পেটিবুর্জোয়া নৈরাজ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, অথচ এই চরিত্রটিই নকশালপন্থী বিপ্লবীদের আন্ডারগ্রাউন্ড শেলটার